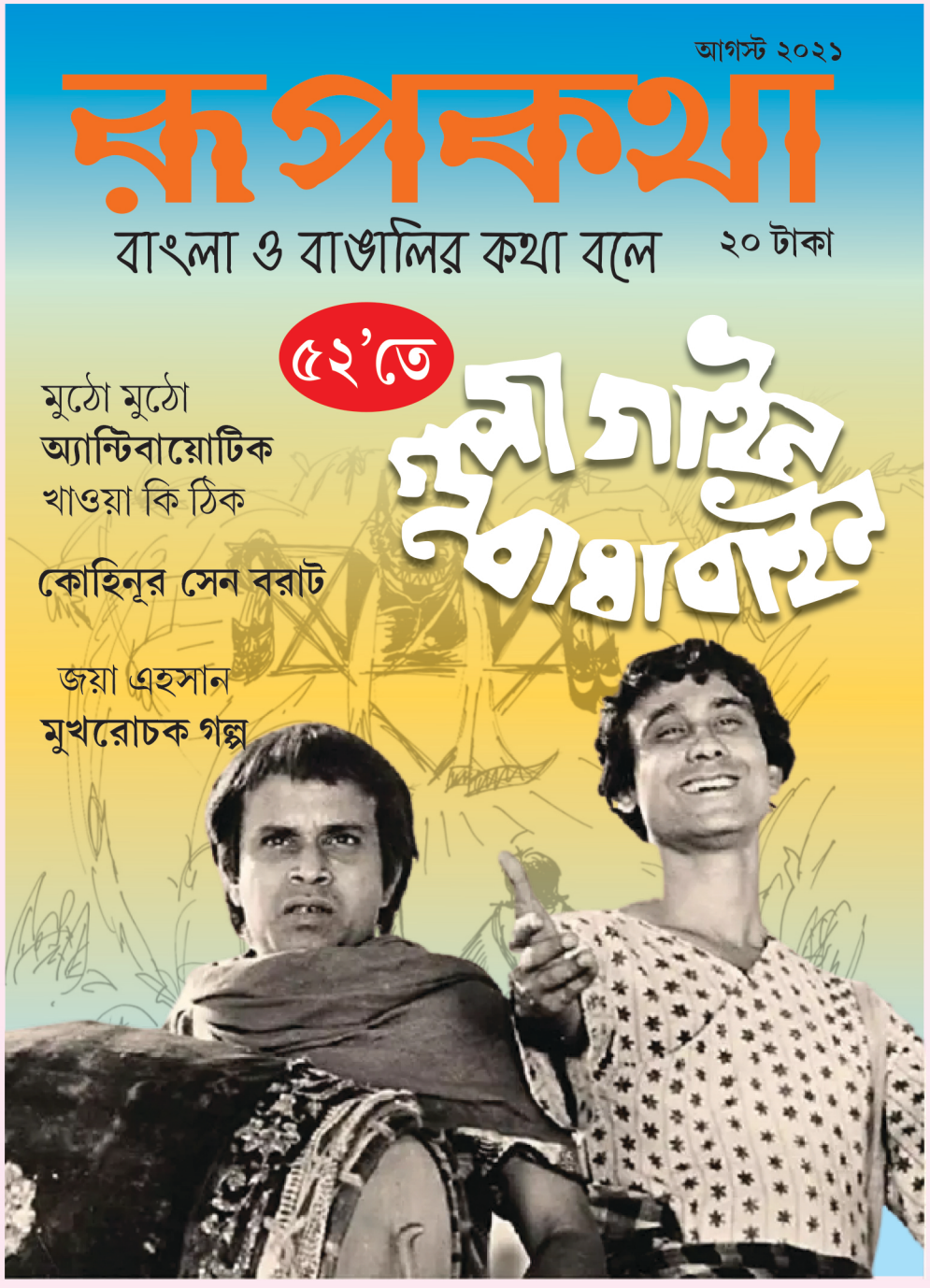

সম্পাদকীয়

শতবর্ষে সত্যজিৎ প্রণাম

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বিশ্বদরবারে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন, ঠিক তেমনি চলচ্চিত্রে বাংলার মান উজ্জ্বল করেছেন সত্যজিৎ রায়। এই ২ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই! সত্যি বলতে কী সত্যজিৎ রায় ছিলেন বাঙালির শেষ আইকন। চলচ্চিত্র ছাড়াও শিল্প, সঙ্গীত ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজেও তিনি আমাদের এখনো পথ প্রদর্শক। করোনা অতিমারির মধ্যে নিঃশব্দে আমরা পেরিয়ে এলাম তাঁর শতবর্ষ। যাবতীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে সবাই নিজের মতো করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি'কে ভারতীয় সিনেমার মাইলস্টোন ধরা হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি 'গুপী গাইন-বাঘা বাইন'। এ বছর এই সিনেমার ৫২ বছর পূর্তি। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে তুলে ধরা হল এই সিনেমার জানা-অজানা অনেক গল্প। এই ছোটো প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শতবর্ষে মহান পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম। পাশাপাশি এই সংখ্যায় রইল নাচের জগতের কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী কোহিনূর সেন বরাট, ২ বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া এহসানের কথা। ৭ দশকে পেরিয়ে এল বাঙালি সংস্থা 'মুখরোচক'। সারা রাজ্যে শিল্প যখন পিছিয়ে পড়ছে, ঠিক তখনই এই বাঙালি সংস্থার অগ্রগতি নিঃসন্দেহে বাঙালি উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে।

সূচিপত্র

শুরুর পাতা	৩-৫
চেনা মুখ অজানা কথা	৬
কবিতা	৭-৮
মনে মনে	৯
বেড়ানো	১০
স্বাস্থ্য	১১-১২
পরিষেবা	১৩
বাংলাকে ফিরে দেখা	১৪
ঘরকন্যা	১৫
আইনি পরামর্শ	১৬-১৭
উদ্যমী বাঙালি	১৮-১৯
কর্পোরেট জগৎ	২০
সংস্কৃতি	২১-২২
অন্য খবর	২৩
হেঁসেল	২৪
রূপলাগি	২৫-২৬
স্মরণীয় মানুষ	২৭-২৮
বিনোদন	২৯-৩০

রূপকথা
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মানসকুমার ঠাকুর
নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার
সম্পাদনা সহযোগী
রাই সরকার
অক্ষরবিন্যাস
ইন্দ্রবুবলি
প্রচ্ছদ
কুন্তল

সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি গুপী গাইন-বাঘা বাইন। বাংলা সিনেমার মাইলস্টোন। টানা ৫১ সপ্তাহ চলে বাংলা ছায়াছবির জগতে রেকর্ড করেছিল। সেই গুপী-বাঘার এ বার ৫২ বছর। সত্যজিৎ শতবর্ষে এই ছবির কিছু জানা-অজানা দিক নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সংকলনে রমাপদ পাহাড়ি।

ছেলের আবদারে

আমাদের প্রিয় পরিচালক বাবুদা ওরফে সন্দীপ তখন ছোট্টটি নয়। ৯-এ পা। দাদু ঠাকুরদার লেখায় ডুবে থাকে। ভেসে বেড়ায় আশ্চর্য জগতে। মনে মনে তার হাজারো কল্পনা- পরিকল্পনা। বাবা সত্যজিৎকে দেখেছে ফিলমের কারিকুরি করতে। রুপোলি ছবি বানাতে। ৯ বছরের বাবুর বেজায় ইচ্ছা, বাবা যেন উপেন্দ্রকিশোরের গুপী-বাঘাকে লেন্স বন্দি করেন। ছেলের অনুরোধের কথাটা সত্যজিৎও মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন। ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরের লেখা 'গুপী গাইন' গল্পটি সত্যজিতেরও যে ছোটোবেলা থেকে বেজায় প্রিয়।

মুক্তি পাক জন্মশতবর্ষে

১৯৬২ সাল। 'অভিযান' ছবি তৈরিতে ব্যস্ত সত্যজিৎ। তার মাঝেই অঙ্কুরিত হয়েছে গুপী-বাঘার গল্প নিয়ে ছবি তৈরির ভাবনা। ইচ্ছের সলতেটা আরও উশকে উঠেছিল এই ভেবে যে, ১৯৬৩-তে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী। এমন মাহেন্দ্রক্ষণে মুক্তি পাক গুপী গাইন বাঘা বাইন। কিন্তু গনগনে ইচ্ছে থাকলেও উপায় করে উঠতে পারলেন না সত্যজিৎ। নানা কারণে ১৯৬৭ পর্যন্ত গুপী গাইনের চিত্রনাট্যই লিখে উঠতে পারলেন না।

আগে গান পরে চিত্রনাট্য

শেষমেশ গুপী গাইনের ভূত জাপটে ধরল তাঁর কলম। চিত্রনাট্য লিখতে বসে বুঝতে পারলেন, শুধু গল্প নয়, আমজনতার উপযোগী করে পরিবেশন করতে হলে দাদুর গল্পে কিছু অদলবদল ঘটাতে হবে। ঠিক করলেন, একটু অপেরাধর্মী 'মিউজিক্যাল' ছবি বানাবেন। চিত্রনাট্যে কলম ছোঁয়ানোর আগেই লিখে

ফেললেন হাফ ডজন গান। এবার তরতরিয়ে কলমে এল মজাদার চিত্রনাট্য। গানগুলোকে বসিয়ে দিলেন জায়গা বুঝে। কিন্তু আরও যে গান চাই। লিখে ফেললেন ৪টে গান।

বদল এল গল্পে-চিত্রনাট্যে

একটু খেয়াল করে দেখবেন, উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন'-এর সঙ্গে ফারাক রয়েছে সত্যজিতের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'এর। উপেন্দ্রকিশোরের শিশু ফ্যান্টাসি তো ছিলই, অধুনামনস্ক সত্যজিৎ তার সঙ্গে বাস্তবের মিশেল ঘটালেন। স্বাভাবিকভাবেই চিত্রনাট্য- জুড়ে এল আরও কিছু নতুন চরিত্র। তাছাড়া গল্পে ছিল গুপী চালাক, বাঘা একটু সাধাসিধে। হাল্লা রাজা ভালো, শুন্ডী দুষ্টু। ছবিতে দুটোই উল্টো। গুপী বোকাসোকা, বাঘা বোঝদার। ভালো শুণ্ডী, হাল্লা খারাপ।

গুপী পৃথ্বীরাজকাপুর আর বাঘা শশীকাপুর

কথাছিল, ছবিটা প্রযোজনা করবেন আর ডি বনশল। ওই সময় রাজনীতির ডামাডোলে বনশল তাঁর প্রস্তাব বাতিল করে দেন। চেষ্টা করা হয় ফিলম ফিনান্স কর্পোরেশনে। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। জনান্তিকে শুনে সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে ছবি করাবার জন্য এগিয়ে এলেন মুম্বইয়ের প্রখ্যাত অভিনেতা কাম প্রযোজক রাজ কাপুর। রাজি হন টাকা ঢালতে। কিন্তু তাঁর রয়েছে শর্ত। ছবির মুখ্য ২ ভূমিকায় অর্থাৎ গুপী হবেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, বাঘা শশী কাপুর। এমন প্রস্তাবে সত্যজিতের মন সায় দিল না। মুহূর্তে ভেস্তে গেল সব কিছু। টাকার জোগান না হওয়ায় ছবি গেল পিছিয়ে। অবশেষে প্রিয়া সিনেমার কর্ণধার কাম অভিনেতা অরিজিৎ দত্তের পূর্বসূরি নেপাল দত্ত রাজি হলেন টাকা দিতে। ঠিক হল ছবির বাজেট হিসাবে ৪ লাখ টাকা দেবেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

সময় হল না কিশোরের

ছবির চরিত্রানুযায়ী অভিনেতাও অত সহজে ঠিক হয়নি। ১৯৬২ সাল। সত্যজিতের মাথায় সবে অঙ্কুর ছড়িয়েছে এই ছবি। সেই প্রাথমিক ভাবনা- কালে ভেবেছিলেন গুপী হবেন কাঞ্চনজঙঘার অরুণ মুখোপাধ্যায়। বাঘা রবি ঘোষ। নানা কারনে ছবি ৫ বছর পিছিয়ে যায়। ঠিক হয় গুপী করবেন কিশোরকুমার। গানগুলো তিনি গাইবেন। 'ডেট' নিয়ে সমস্যার কারণে কিশোরকুমার 'না' করলেন। এলেন জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি পরে সত্যযুগের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। অবশেষে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মী তপেন চট্টোপাধ্যায়। তপেন একসময় সন্দেশ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগেও কাজ করেছেন। সত্যজিতের পূর্ব পরিচিত। 'মহানগর' ছবিতেও একটা ছোটো ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। বাঘা গোড়া থেকেই ঠিক হয়েছিল রবি ঘোষ। কিশোরকুমারের অক্ষমতায় সত্যজিৎ যোগাযোগ করলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনুপ ঘোষালের সঙ্গে। বাকিটা তো ইতিহাস।

ভাবী রাজার মৃত্যু

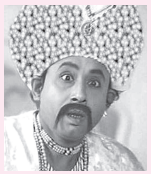

হাল্লা ও শুণ্ডী রাজার চরিত্রে প্রথমে ভাবা হয়েছিল ছবি বিশ্বাসকে। হাল্লা মন্ত্রী হবেন তুলসী চক্রবর্তী। পরে ২ জনেই মারা যাওয়ায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সন্তোষ দত্ত ও জহর রায়। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয় শুটিং। বীরভূমের নতুন গাঁ, শিমলার কাছে কুফরি, জয়সলমির থেকে মাইল ২০ দূরে আউটডোরে শুটিং হয়েছিল এই ছবির। কথা ছিল জানুয়ারিতে ছবি মুক্তি পাবে। কিন্তু ওই সময় বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে ঘনিয়ে ওঠে রাজনীতির কালো মেঘ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে থাকে মুক্তির তারিখ। অন্যদিকে বার্লিন ও মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসব থেকে

ছবিটা দেখানোর অনুরোধ আসে। অবশেষে অনেক টালবাহানার পর ১৯৬৯-এর ৮ মে ২৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও ইংরিজি সাবটাইটেল-সহ গ্লোবে মুক্তি পায় গুপী গাইন বাঘা বাইন।

সৌমিত্রের আবদার, সত্যজিতের না

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর চিত্রনাট্য শোনার পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মন একেবারে উসখুশ করছিল। তিনি আগ বাড়িয়ে গুপীর চরিত্রটা করতে চেয়েছিলেন। আবদারও জানিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় হেসে বলেন, ওই চরিত্রটি সৌমিত্রের না করাই ভালো। কিন্তু সৌমিত্র তখন একবগ্গা। তিনি ভরসা দেবার চেষ্টা করেন সত্যজিৎকে এই বলে যে, গুপী চরিত্রে ভালোই করবেন। প্রত্যুত্তরে সত্যজিৎ বলেন, তাঁরও বিশ্বাস সৌমিত্র ভালোই করবেন। কিন্তু তাঁর কল্পনায় গুপীর যে আরো গ্রাম্য চেহারা হবার দরকার। ভূতের নৃত্যের ব্যাপারেও প্রথমে উদয়শঙ্করের পরামর্শ নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষমেশ ২ জনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। তাই শেষমেশ শম্ভু ভট্টাচার্য সত্যজিতের কল্পনাকে রূপ দিয়েছিলেন।

এক নজরে
গুপী গাইন - বাঘা বাইন

ছবি- সাদা-কালো- ১৫ রিল, ৩৫ মিমি।
প্রযোজনা- পূর্ণিমা পিকচার্স
গল্প- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
চিত্রনাট্য, পরিচালনা, গানের কথা ও সুর- সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ- সৌমেন্দু রায়
শিল্প- বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা- দুলাল দত্ত
অভিনয়- তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, সন্তোষ দত্ত, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, কামু মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়।
পরিবেশনা- পিয়ালী ফিলমস
মুক্তি- ৮মে, ১৯৬৯। মিনার, বিজলী, ছবিঘর, গ্লোব।
পুরস্কার- শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য স্বর্ণপদক, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ১৯৬৮
- শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ১৯৬৮
- অ্যাডিলেড ফিলম ফেস্টিভ্যাল, ১৯৬৯, সিলভার ক্রস পুরস্কার
- অকল্যান্ড ফিলম ফেস্টিভ্যাল, ১৯৬৯, সেরা পরিচলনার পুরস্কার
- টোকিও ফিলম ফেস্টিভ্যাল, ১৯৭০, মেরিট অ্যাওয়ার্ড
- মেলবোর্ন ফিলম ফেস্টিভ্যাল, ১৯৭০, সেরা ছবির পুরস্কার

কৃতজ্ঞতা- তথ্যকেন্দ্র

গুপী বাঘার গান

গুপীর সব ক'টা গান গেয়েছিলেন অনুপ ঘোষাল। গানের মধ্যে যেখানে বাঘা ফোড়ন কেটেছে, সেখানে গলা রবি ঘোষের। গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে আছে 'যত সব আমির ও ওমরী' গানটি গেয়েছিলেন অভিনেতা কামু মুখার্জি। ভূতের রাজার সেই ভূতুড়ে গানটা গেয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। এই ছবিতে ব্যবহার হয় এই **৯টি** গান- ● গুপী বাঘা গুপী বাঘা / ভয় নেই, ভয় নেই ● দ্যাখোরে নয়ন মেলে ● ভূতের রাজা দিল বর ● মহারাজা! তোমারে সেলাম ● ওরে বাঘারে ● ও মন্ত্রী মশাই ● আছো হেথা যত ● এক যে ছিল রাজা তার ভারি দুখ ● ওরে বাবা দ্যাখো চেয়ে।

কর্পোরেট জগতে কাজের সূত্রে রাজনীতিবিদ থেকে শিল্পপতি নানা মানুষের কাছাকাছি এসেছেন কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট **মানসকুমার ঠাকুর**। এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় তিনি এক একজন মানুষের অজানা কথা তুলে ধরবেন।

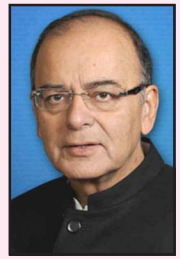

বর্ণময় মানুষ ছিলেন অরুণ জেটলি

২০১৫ সালের ২২ জুলাই। আমি দি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলাম। প্রোটোকল অনুসারে পরের দিন আমাদের দেখা করতে হয় অর্থ মন্ত্রক ও কর্পোরেট মন্ত্রকের বিভাগীয় মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। সবার সঙ্গে দেখা হলেও বিভাগীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে দেখা হল না। অধীর অপেক্ষায় ছিলাম। দেশের অর্থমন্ত্রী বলে কথা। শেষ পর্যন্ত ১ আগস্ট দেখা হল অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু সেভাবে আলোচনার সুযোগ হল না। তবে প্রথম দেখাতে মুগ্ধ হলাম ওনার ব্যক্তিত্বে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কথা কম বলেন। ভালো শ্রোতা। সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ছিলাম বলে আরো ২ বার আমাদের দেখা হয় কিন্তু আলোচনার সুযোগ হয়নি। অপেক্ষায় ছিলাম। কবে ওনাকে বোঝাতে পারব কেন ভারতে কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দরকার। পরের বছর আমি দি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট ম্যানেজমেন্ট-র সভাপতি নির্বাচিত হলাম। আর এই সভাপতি হওয়ার জন্য বার বার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে দেখা হয়। ধীরে ধীরে আমি ওনার ফ্যান হয়ে উঠি। আমি বার বার ওনাকে বোঝাতে চাইতাম আমাদের দেশে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটা। আর কেন জানি না উনি অন্যদের তুলনায় আমাকে একটু বেশি 'স্পেস' দিতেন।

২০১৬ সালে আমাদের সংস্থার জাতীয় সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ছিলেন আমাদের প্রধান অতিথি আর আমি ছিলাম চেয়ারম্যান। ওই সম্মেলনে তাঁর ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করেন। সেদিন দেখেছিলাম ওনার দূরদর্শিতা। উনি সবসময়ে সময়ের থেকে এগিয়ে ভাবতেন। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতেন। একান্ত আলোচনায় অরুণ জেটলি আমাকে বলেন, ভারতের জনসংখ্যা একটা সমস্যা কিন্তু সমস্যাটাকে সুযোগ ও সম্ভাবনায় পরিণত করা যায়। কিন্তু একটা শ্রেণি খুব স্বার্থপর। লোভী হয়ে গেছে। দূরদর্শিতার জন্য অরুণ জেটলি ভারতের মতো দেশে জিএসটি, আইবিসি, ভ্যালুয়েশন অ্যাকট ইত্যাদি এনে একটা আর্থিক বদল আনতে পেরেছেন।

অরুণ জেটলি দেখা হলেই আমাকে বলতেন, তোমার কথাই ঠিক। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশাদারদের খুব দরকার। কিন্তু আমাদের নেতাদের লক্ষ স্থির নেই। তোমরাই ভারতের কাণ্ডারী হতে পারো। যদি সঠিক পরিকল্পনা থাকে।

আমার কাছে অরুণ জেটলি ছিলেন 'গ্রেট লিডার'। যথার্থ নেতা। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি কারণ আমি সেই সময় সর্ব ভারতীয় সভাপতি ছিলাম।

তিন অন্ধ

বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস

অন্ধকারে অন্ধ চলে লণ্ঠন নিয়ে হাতে,
সতর্ক করে অন্যকে চাপা না দেয় যাতে;
দিবালোকে চলে তারা হাতে নিয়ে যষ্ঠি,
যষ্ঠিতেই পথ চলে কখনো বাজায় বাটি।
এভাবেই কাটায় জীবন দুঃখ নিয়ে হাঁটি!

মনুষ্যত্বে অন্ধ যারা তাদের আঁধার ভরা বুকে,
অন্যের হাতে লণ্ঠন ধরাতে নিত্য থাকে ঝুঁকে;
অন্যের আলো নিভাতে তারা খুবই সিদ্ধহস্ত,
সেই আঁধারে গড়ে প্রাসাদ আঁধারেই ন্যস্ত।

আরেক অন্ধ সন্তানের দোষ পায় না কভু খুঁজে,
বড়ো হলে তাদেরই অন্যায় সহে মাথাটা গুঁজে!
তখন আর পারে না বলতে তা অন্য কারো সনে,
দিনে দিনে পুড়ে মরে আক্ষেপ করে তীব্র দহনে;
আপশোসে বলে, এর থেকে থাকা ভালো বনে!

খোঁজ

পূবালি চ্যাটার্জি

কবিতার পাতা শেষ হয়ে গেছে
জীবন এখন 'প্রবন্ধ সংকলন'।
আবার করে গুছিয়ে নিচ্ছে;
অগোছালো যত সময়ের হিসেব।
জানালার ফাঁক দিয়ে চোখ যায়-
'মৌচাকে'।
'ওরা' উড়ে গেছে বাসা ফেলে,
হয়তো নিরুদ্দেশে-
হয়তো ওরাও জানে শেষ হলে জীবন রসদ
উড়ে যেতে হয়, চলে যেতে হয়
তিল তিল রক্তক্ষরণে গড়া বাসাবাড়ি ছেড়ে!
মাঝে মাঝে দু-একটা মৌমাছি
ফিরে আসে-
হয়তো হিসেব মেলাতে।
ফিরে যায় অবশেষে, রিক্তনিঃস্ব বাসাখানি ফেলে।
হয়তো আলোর উৎস স্রোতের সন্ধানে,
ফুলের আঘ্রাণ আর মধু
জীবন যেখানে অনাবিল স্নেহমাখা মায়াময়
সেই খোঁজে...!

তুমি যদি বলতে আমায়

দীপ্তজিৎ মুখার্জি

তুমি যদি বলতে আমায়,
এই বেলাটি থাকো পাশে
পুরোনো সেই ডাকপিওনের ঝোলায় বাঁধা রঙিন চিঠি
আমিও ইচ্ছে নিয়ে ঝর্ণাআলা নদীর আশে
ফিরে আর লিখলে না সেই মনখারাপির বর্ণগীতি
তোমাকে খুঁজে ফিরি অকুল গাঙের অঝোর ধারায়!
কাগজ, কালির দোয়াত তোলা, তাকিয়ে থাকে অন্তরালে
পারতে লিখতে যদি কিছু বিশেষ কথা মন আঙিনায়
নীরবে দিন কেটে যায়, রাতের গতিক ভিন্নতালে
এসময় একটা দুটো কথাই জানায় অনেক খেয়ায়
বেহালা একটানা সুর কবে আবার সমে নেবে
মন তো মনের খাতায় লেখাগুলো আউড়ে বেড়ায়
কবে তুমি আবার, তোমার অক্ষরেতে জানান দেবে
লিখে যাও একটু কিছু বর্ণচোরা শব্দ বিশেষ
টানা আর দোটানাটাতে আমি না হয় আশায় আসি
কিছু না বলার থাকুক, মন মিলনের এই যে নিবেশ
শুধু নয় বলেই গেলে 'সত্যি তোমায় ভালোবাসি!'

বৃষ্টি যখন দুষ্টু

প্রণতি মণ্ডল

ইচ্ছে করে বৃষ্টি তোরে
বন্দি করে রাখি।
মেঘের সাথে বন্ধ করি
যত্ত মাখামাখি।
যুক্তি করে মেঘের সাথে
ঢাকিস আকাশ খানা।
যখন তখন কাঁদিস বসে
শুনিস না তো মানা।
ঘরের মেঝে জলে ভিজে
সংসার সব খাটে।
হাঁটু জলে বাজার সেরে
কর্তামশাই হাঁচে।
ছেলে পুলে বন্দি ঘরে
করছে সবাই যুদ্ধ।
জলের ঘরে গন্ধ জলে
কিচ্ছুটি নাই শুদ্ধ।
তোর কারণে জল থৈ থৈ
চাষের জমি যতো।
বীজ ফেলবার সময় গেল
চলিস নিজের মতো।
একটি কথা বলছি বাছা
করিস না মুখ কালো।
সবার ব্যথা বুঝবি, তবে
বাসবে সবাই ভালো।

সংবাদ জগতের চেনা-অচেনা কথা

রফিক আনোয়ার

শুভাশিসদা মানে শুভাশিস মৈত্র। কলকাতা টিভি-তে কয়েকদিন কাজ করার সুবাদে ওঁর সঙ্গে পরিচয়। নাম অনেক আগেই জানতাম জাঁদরেল সাংবাদিক হিসেবে। বেশ কয়েকমাস আগে ফেসবুকে ওঁর একটা পোস্ট দেখলাম। পুরোনো দিনের বিজ্ঞাপন। উনি তাতে কমেন্ট করেছেন, 'বিজ্ঞাপনের মতো জীবনও কত সোজা ছিল'। কলকাতা টিভি-তেই শুভাশিসদা একদিন আমাকে কোনো এক বাম নেতার ভাষণের ট্রুকপি করে দিতে বললেন। অন্য কোনও এক নিউজ চ্যানেলে নেতার ওই ভাষণ সম্প্রচার করা হয়েছে। তাঁর ভাষণ জুড়ে ছিল উত্তেজনার ছোঁয়া। 'গুলি করে মেরে ফেলব' জাতীয় কিছু কথা তাতে বলা হয়েছিল। নেতাটির নাম আজ আর মনে নেই। যাই হোক, আমিও ওই কথাটাই লিখে দিয়েছিলাম। লেখা হয়ে যাওয়ার পর আমার ডাক পড়ল শুভাশিসদার চেম্বারে। আমাকে বার দুই জিজ্ঞাসা করলেন, নেতা ওই কথাই বলেছেন, ঠিক শুনেছ তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, মানে ওই কথাটাই তো শুনলাম। শুভাশিসদা ফের বললেন, ঠিক করে শুনেছ তো? এবার আমারও মনে কেমন সন্দেহ দানা বাঁধল। এইভাবে কেন বার বার আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে! তাহলে কি আমি ভুল কথা বসিয়ে দিয়েছি নেতার মুখে? ঠিক উদ্ধৃতি দিইনি? নাকি, শুভাশিসদা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ওই নেতা ওই বিস্ফোরক কথা বলতে পারেন! আমার অবস্থাটা আঁচ করতে পারলেন শুভাশিসদা। বললেন, এটা তো ইলেকট্রনিক চ্যানেল! একই সঙ্গে দেখছি আর শুনছি। বক্তার মুখে নিজের মতো করে কথা বসিয়ে দিলেই মুশকিল। মামলার ঝুটঝামেলাতেও পড়তে হতে পারে। তাই তোমার থেকে যাচাই করে নিচ্ছি। আমি ভাষণটা শুনতে পারিনি তো। তাছাড়া, নিজের মনের কথা অন্যজনের মুখে বসিয়ে দেওয়া অনৈতিক। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বরুণদাও (বরুণ সেনগুপ্ত) প্রায় বলতেন, 'খবরটা খবর হিসেবেই লিখবে। সেখানে তোমার মনে হওয়া জিনিস মেশাবে না। নিজের ভাবনাকে কখনোই খবরের সঙ্গে মেশাবে না। তোমার যা ভাবনা তা নিশ্চয়ই লিখবে। তবে তা ওপেড বা সম্পাদকীয়তে।' নিজের কথার তুলনায় অন্যের কথাকে তিনি সবসময়ই অগ্রাধিকার দিতেন। শিরোনামও করতে বলতেন সোজাসাপ্টা, সহজ। কোনও প্যাঁচপয়জার মেরে নয়।

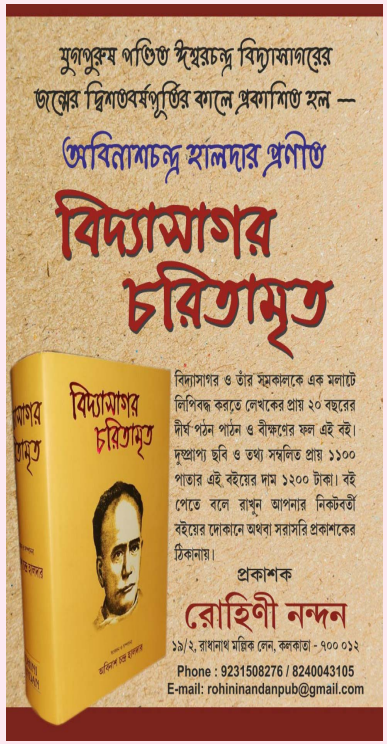

দক্ষিণের সমুদ্রে

কাছেই কম খরচে সমুদ্রভ্রমণ। ঘুরে আসুন দু-তিনদিন। হদিশ দিলেন **গৌতম ঘোষ**

গঙ্গাসাগর

সব তীর্থ বারবার/গঙ্গাসাগর একবার। লাইনগুলো প্রায় প্রবাদের চেহারা নিয়েছে। একবার নয়, গঙ্গাসাগর একবার গেলে বারবারই যেতে ইচ্ছে করবে। তবে যদি নির্ভেজাল বেড়াতে চান, তাহলে গঙ্গাসাগর মেলার সময় না গেলেই ভালো।

কীভাবে যাবেন-কলকাতা থেকে কাকদ্বীপের বাস ধরুন। কিছুটা আগে হার্ড উড পয়েন্টে নেমে পড়ুন। সেখান থেকে ভ্যান রিক্সায় লঞ্চঘাট। প্রায় ৩০ মিনিট পর পর লঞ্চ পাবেন। উত্তাল নদী পেরিয়ে ৩০মিনিটের ওই যাত্রাপথটাও দারুন। আরো ভালো লাগবে, যদি লঞ্চের ছাদে উঠে পরেন। নদীর ওপারে কচুবেড়িয়া। সেখান থেকে সাগর প্রায় ৬০ মিনিটের পথ। ট্রেকার, বাস, ভটভুটি পেয়ে যাবেন। চাইলে গাড়ি ভাড়া করে নিতেও পারেন। শনি-রবিবার ভিড় একটু বেশি থাকে। তবে থাকার অনেক জায়গা রয়েছে। থাকতে পারেন যুব আবাসে। সমুদ্রের কাছেই রয়েছে হোগলা কটেজ।কপিল মুনির আশ্রম, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ও জায়গা হয়ে যাবে। একটু বেশি খরচ করতে চাইলে বেশ কিছু বেসরকারি হোটেল পেয়ে যাবেন। সন্ধের পর খুব বেশিক্ষণ সৈকতে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না। ভিন্নরাজ্য থেকে আসা অনেক সাধুসন্ত ও ধর্মপ্রান মানুষকে পেয়ে যাবেন। সেই সাধুদের বিচিত্র জীবনযাপন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। সবমিলিয়ে ২টো দিন বেশ ভালোই কেটে যাবে।

হেনরি আইল্যান্ড

নির্জনে সমুদ্রে কাটাবেন? চোখ বুজে চলে যেতে পারেন হেনরি আইল্যান্ড। একেবারে নির্ভেজাল নির্জনতা বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। নামটা শুনে বিদেশ বিদেশ মনে হচ্ছে? পাশেই, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আদৌও দুর্গম পথ নয়। বককালির আগেই। ধর্মতলা থেকে বকখালি যাওয়ার অনেক বাস। ট্রেনে শিয়ালদা থেকে যেতে পারেন নামখানা। সেখান থেকে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পেরিয়ে পেয়ে যাবেন অসংখ্য বাস, গড়ি। সব মিলিয়ে ৪ ঘন্টা লাগবে। বককালির ঠিক আগেই বেঁকে যাবেন বামদিকে। নিজের গাড়ি থাকলে তো কথাই নেই। না থাকলেও বাস স্ট্যান্ট থেকে গাড়ি ভাড়া নিতে পারেন। থাকার জায়গা বলতে মৎস্য দফতরের ২টো গেস্ট হাউস। বুকিং করতে হয় বিকাশ ভবনে,রাজ্য ফিসারিজ উন্নয়ণ নিগমে। তবে গেস্ট হাউস থেকে সৈকত বেশ কিছুটা দূরে। যেতে হবে ম্যানগ্রোভ অরন্যের ভেতর দিয়ে। নির্জন বিচে সময় কাটান, ভালো লাগবে। সন্ধের দিকে গা ছমছম করতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসাই ভালো। ২ দিন থাকতে পারেন।

মুঠো মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষতি করছে অজান্তেই

ডাঃ মৌসুমী বসু

অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ, এসএসকেএম হাসপাতাল

অ্যান্টিবায়োটিক কথাটা এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। অ্যান্টি মানে বিরুদ্ধে আর বায়োস মানে লাইফ বা জীবন। এখানে জীবন বলতে ব্যাকটেরিয়ার জীবন বোঝায়। আসলে ব্যাকটেরিয়ার জীবাণু প্রতিরোধ করে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ।

বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ পেনিসিলিন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯৪৪ সালে পেনিসিলিয়াম নামে এক ক্ষুদ্র ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন উদ্ভাবন করে চিকিৎসা জগতে আলোড়ন তৈরি করেন। পরে স্টেপটোমাইসিন নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্ষয় রোগের ওষুধ আবিষ্কার হয়। এখন ১০০টির বেশি অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে।

কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের শরীরে কাজ করে?

অধিকাংশ রোগের উৎস ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও প্রোটোজোয়া থেকে। ব্যাকটেরিয়া মূলত উদ্ভিদজাত। মানুষের শরীরে পরজীবী হিসেবে বাস করে ও মারাত্মক রোগ তৈরি করে। অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরিতে সাহায্য করে ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কোন কোন রোগে কাজ করে?

অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাস নয়, শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াজাত রোগের ক্ষেত্রে কাজ দেয়। যেমন, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, টিবি, ডিপথেরিয়া, আন্ত্রিক, কলেরা, আমাশা, ধনুস্টংকার, মেনিনজাইটিস, প্রস্লাবে সংক্রমণ ইত্যাদি।

অ্যান্টিবায়োটিক-এর ব্যবহার ও প্রয়োগ

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় ওরাল পিল, ইঞ্জেকশন ও মলম হিসেবে। শিশুদের ক্ষেত্রে সিরাপ হিসেবে ব্যবহার হয়।

খাওয়ার নিয়ম

অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয় খালি পেটে। নিয়ম হল, খাওয়ার ঠিক ৬০ মিনিট আগে বা ১২০ মিনিট পরে। যে কোনো বয়সে খাওয়া যায়।

সর্তকতা

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সময় যেসব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার-

- গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে
- শিশুদের ক্ষেত্রে
- লিভারের সমস্যা থাকলে
- কিডনির সমস্যা থাকলে

ইচ্ছেমত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া

নিজে বা পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে, চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে ওষুধ কিনে খাওয়া আমাদের দেশে প্রচলিত। এই মানসিকতার পেছনে সবজান্তা মনোভাব কাজ করে। কিছু মানুষ চটজলদি ফলাফল পেতে চান। যেমন, সর্দি-কাশি হলে মোটামুটি ৭ দিন থাকবেই। অ্যান্টিবায়োটিক খেলেও ৭দিন সময় লাগবে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার শুধু নিজের নয়, সমাজেরও ক্ষতি করে।

অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ লিভার ও কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই যথেচ্ছভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় লিভার ও কিডনি। না বুঝে শুনে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে ও ওষুধের পুরো মেয়াদ শেষ না করলে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট করে নেয়। এর ফলে পরে ওই অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করে না। তখন আরও বেশি মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার হয়। যার থেকে শরীরে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

- শারীরিক দুর্বলতা
- ডায়েরিয়া
- পেট খারাপ
- গা গুলানো ভাব
- অ্যালার্জির প্রকোপ

বুঝে চলুন

- অপ্রয়োজনে যখন-তখন অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না।
- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কখনোই নয়।
- ওষুধ বিক্রেতার কথায় প্রভাবিত হয়ে ভুলেও অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না।
- পুরোনো প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ওষুধ কিনবেন না।
- ওষুধ কেনার সময় মেয়াদ দেখে নেবেন।

ব্যাঙ্কিং সমস্যায় সুরাহার হদিশ

আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আমরা নানা প্রকল্পে টাকা রাখি। সব গ্রাহকেরই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সঠিক পরিষেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কোনো কারণে ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় সমস্যা দেখা দিলে ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা বিভাগে আবেদন করতে পারেন।

ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইন অনুসারে গ্রাহকদের অভিযোগ ও সমস্যা সুরাহার জন্য চালু হয় ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৯৫ সাল থেকে এই স্কিম চালু করে। এখন সারা দেশে চালু রয়েছে ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান স্কিম। শীর্ষ ব্যাঙ্কের নিয়োগ করা বরিষ্ঠ আধিকারিকরা ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান বিভাগে কাজ করেন। তাঁদের কাজ হল গ্রাহক ও ব্যাঙ্ক এই দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদর কার্যালয়ে এই ব্যবস্থা রয়েছে।

কারা ও কীভাবে অভিযোগ জানাতে পারেন

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিলে গ্রাহককে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে অভিযোগ জানাতে হবে। যদি ১ বছরের মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান না হয় বা ব্যাঙ্কের কাজে গ্রাহক খুশি না হন, তাহলে ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান-এ অভিযোগ জানাতে পারেন।

অভিযোগ জানাতে হবে সাদা কাগজে নির্ধারিত বয়ানে। এছাড়াও অভিযোগ জানাতে পারেন ইমেল বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। অভিযোগপত্রে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্কের শাখার নাম ও নির্দিষ্টভাবে অভিযোগের বিষয় থাকতে হবে। ব্যাঙ্কের যে কোনো গ্রাহক সমস্যায় পড়লে অভিযোগ করতে পারেন। এর জন্য কোনো খরচ লাগে না।

কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করা যায়

দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান সেলে যে সব বিষয়ে অভিযোগ করা যায়-

(১) ব্যাঙ্কের চেক, ড্রাফট ও বিল সংক্রান্ত কোনো সমস্যায়

(২) ব্যাঙ্কের লেনদেন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে

(৩) কারণ ছাড়াই ব্যাঙ্ক কোনো চেক, ড্রাফট নিতে অস্বীকার করলে

(৪) ব্যাঙ্কিং সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে

(৫) কারণ ছাড়াই ব্যাঙ্ক প্রাপ্য টাকা দিতে দেরি করলে

(৬) আগাম নোটিশ ছাড়াই লেভি সংক্রান্ত টাকা নিলে

(৭) ব্যাঙ্কের নতুন যোজনা সংক্রান্ত কোনো ভুল তথ্য দিলে

(৮) ব্যাঙ্কের কোনো কর্মচারী বা আধিকারিক খারাপ ব্যবহার করলে

(৯) এটিএম, ডেবিট, ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে

(১০) সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের গাফিলতিতে মোবাইল ব্যাঙ্কিং, বৈদ্যুতিন পরিষেবায় সমস্যা হলে

(১১) কারণ ছাড়াই গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হলে

(১২) প্রাপ্য ঋণ পেতে কোনো সমস্যা হলে

কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ নেওয়া হয় না

(১) যেসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই

(২) অভিযোগ সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ না থাকলে

(৩) ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পেলে

(৪) অসত্য কোনো অভিযোগ করলে

(৫) যেসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা ২০ লাখ টাকার নীচে হয়

(৬) যেখানে ব্যাঙ্কের কর্মীদের গাফিলতির কোনো প্রমাণ থাকে না

কীভাবে সুরাহা হয়

অভিযোগকারী ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলাদাভাবে ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান আলোচনায় বসে ও তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যাঙ্কিং ওমবুডসম্যান ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়।

বাংলাকে ফিরে দেখা

- ভারতের প্রথম মেট্রোপলিটন শহর- কলকাতা।
- ভারতের প্রথম ওয়াইফাই শহর- কলকাতা।
- ভারতের প্রথম আইআইএম- কলকাতায় (জোকায়)।
- ভারতের প্রথম আইআইটি-খড়গপুর (১৯৬০ সালে)।
- ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ভারতের প্রথম কলেজ- প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮১৭ সালে) ভারতের সবচেয়ে পুরোনো স্কুল-সেন্ট টমাস।
- ভারতের প্রথম পুরুষ স্নাতক- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বোস।
- ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক- কাদম্বিনী গাঙ্গুলি।
- ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ভারতের প্রথম অস্কার পুরস্কার প্রাপক- সত্যজিৎ রায়।
- ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী- সুচেতা মজুমদার (স্বাধীনতা সংগ্রামী)।
- ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক- ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান (১৭৭০)। পরে নাম হয় ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক।
- ভারতে প্রথম সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন-রাজা রামমোহন রায়।
- ভারতে প্রথম বাল্য বিবাহ রদ করেন- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ভারতের জাতীয় সেবাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা- সুভাষ চন্দ্র বসু।
- ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ভারতের প্রথম সংবাদপত্র - হিকির বেঙ্গল গেজেট।
- ভারতের (পশ্চিমবঙ্গের) প্রথম মিস ইউনিভার্স - প্রমিলা (১৯৪৭)।
- ভারতের প্রথম ভারত রত্ন উপাধি পান- ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।
- ভারতের প্রথম জাদুঘর- ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (১৮১৪)।

এরপর ২৩ পাতায়

পোশাকের জৌলুস থাকবে অটুট

আমরা পোশাক কেনার ব্যাপারে যতটা আগ্রহী থাকি তার দেখভালের ব্যাপারে কিন্তু ততটাই উদাসীন হই। ফল যা হওয়ার, তাই হয়। অনেক টাকা খরচ করে কেনা ড্রেসও ২-৪ বার পরার পর আর তার জৌলুস থাকে না। অথচ ঠিক মতো রাখতে পারলে একটা কম দামের পোশাকও অনেক বেশিদিন ভালোভাবে পরা যায়। তাই জেনে নিন পোশাকের যত্নআত্তির কিছু সহজ উপায়।

(১) আলমারিতে পোশাক ঝোলানোর হ্যাঙার কেনার সময় দাম দিয়ে কিনবেন। সস্তার হ্যাঙারে পোশাক ঠিকমতো থাকে না। কুঁচকে যায়। সবচেয়ে ভালো হয় কাঠের হ্যাঙ্গার কেনা। প্লাস্টিকের হ্যাঙার কিনলে মোটা ধরনের কিনবেন।

(২) সোয়েটার কখনও হ্যাঙ্গারে ঝোলাবেন না। এএত সোয়েটারের শেপ নষ্ট হয়ে যায়। ভাঁজ করে আলমারির মধ্যে আলাদা জায়গায় যত্ন করে রাখুন।

(৩) প্রতিটা পোশাকের ভাঁজে রেখে দিন ন্যাপথলিন বা শুকনো নিমপাতা। এতে পোকা ধরবে না।

(৪) ন্যাপথলিন একটা কাগজে মুড়ে তবেই পোশাকের মধ্যে রাখবেন। ন্যাপথলিন ভালো মানের না হলে তার দাগ কাপড়ে লেগে যেতে পারে। সোনালি বা রূপালি জরি থাকলে তাও নষ্ট হতে পারে।

(৫) সুগন্ধি, হেয়ার স্প্রে, বডি স্প্রে ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন। পোশাকে লাগালে তার বিশ্রী দাগ ধরে যেতে পারে। হাজার বার ধুলেও সে দাগ মেলায় না।

(৬) বিশেষ বিশেষ কাপড়ের বিশেষভাবেই যত্ন নিতে হয়। কেনার সময় ভালোভাবে বুঝে নিন, কোনটার যত্ন কীভাবে নেবেন।

(৭) উলের কোট বা জ্যাকেট প্রতিবার ব্যবহারের পর ব্রাশ করে নেবেন। বিশেষ করে ঘাড়ের দিকটা। অবশ্যই হ্যাঙারে করে ঝুলিয়ে রাখবেন। যে সব পোশাক বিশেষ ঋতুতে দরকার সেগুলো আলাদা জায়গায় রাখুন।

(৮) পোশাক গরম জলে ভেজানোর আগে ভালো করে দেখে নিন তা কোন উপাদানে তৈরি। রেয়ন, উল, সিল্ক ও অন্যান্য অনেক ধরনের কাপড় গরম জলে দিলে তার রঙ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিছু কিছু পোশাক কুঁচকেও ছোটো হয় যায়।

(৯) পোশাক ধোওয়ার সময় মাথায় রাখবেন ডিটারজেন্টের পরিমাণ যেন খুব বেশি না হয়। ডিটারজেন্ট অবশ্যই জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে কাপড় তুলে নেবেন। নয়তো পোশাকে লেগে থাকা ডিটারজেন্ট যেমন পোশাকের রঙ নষ্ট করতে পারে, তেমনি আপনার ত্বকেরও সমস্যা হতে পারে।

(১০) জামাকাপড়ে আচমকা চুইংগাম লেগে গেলে সেখানে ভালো করে বরফ ঘষে নিন। চুইংগাম উঠে যাবে।

নারী সুরক্ষায় আইন

নারীদের সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন রয়েছে যা প্রতিটা মেয়ের জানা দরকার।

ইভটিজিং : রাস্তাঘাটে মেয়েদের অশালীন ইঙ্গিত ও কটূক্তি করা হলে আইনের চোখে তা ইভটিজিং। এই তালিকায় রয়েছে- রাস্তাঘাটে মেয়েদের বিরক্ত করা বা জ্বালাতন করা, কটূক্তি করা, অশালীন গালাগালি করা, অশ্লীল এসএমএস করা, জোর করে গায়ে হাত দেওয়া, আপত্তিকর যৌন আচরণ করা।

ইভটিজিংয়ের শিকার হলে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে। এরপর স্থানীয় থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অবশ্যই সাক্ষী থাকতে হবে।

স্থানীয় থানা অভিযোগ না নিলে কী করবেন

স্থানীয় থানা অভিযোগ না নিলে সরাসরি লালবাজারের একতলায় উইমেন্স গ্রিভ্যান্স সেল-এ অভিযোগ জানাতে পারেন।

বিচার ও শাস্তি

কেস অনুযায়ী ইভটিজিংয়ের বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। বিষয়টা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ নং ধারার অন্তর্ভুক্ত। তবে ইভটিজিং খুন বা ধর্ষণের মতো অপরাধ নয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে আসে। তাই এটা জামিনযোগ্য অপরাধ। সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত সাজা হয়, তবে বর্মা কমিশন শাস্তির মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ করেছে।

শ্লীলতাহানি : যৌন হেনস্তার একটা ভাগ হল শ্লীলতাহানি। কোনো মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পর্ক তৈরি করাকে শ্লীলতাহানি বলা হয়। এটা নানা ধারায় হতে পারে। যেমন, ১. কোনো মহিলাকে ব্যক্তিগত মুহূর্তে লুকিয়ে দেখা ২. রাস্তায় অনুসরণ করা ৩. রাস্তাঘাটে হাত ধরে টানা ৪. পথ আটকানো ৫. ফোন করে বারবার বিরক্ত করা ৬. পর্নোগ্রাফি দেখানো ৭. কোনো মহিলার নগ্ন ছবি তোলা।

শ্লীলতাহানির শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় আভিযোগ জানাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো কাজ না হলে সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

বিচার ও শাস্তি

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত। কেস অনুযায়ী ১ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত

সাজা হয়।

কাজের ক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা

অফিস-আদালত, যে কোনো কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অনেক সময়ই যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয়। কাজের ক্ষেত্রে হেনস্তা বলতে বোঝায়- ১. কোনো মহিলা সহকর্মীর গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা ২. মহিলা সহকর্মীর উদ্দেশ্যে যৌন রসাত্মক কথা বলা ৩. যৌন রসিকতা করা ৪. অশ্লীল ছবি দেখানো ৫. অশ্লীল বই দেখানো ৬. গোপন অঙ্গ দেখানো ৭. অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা।

এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সাক্ষী রাখুন। তারপর যা করবেন-১. সহকর্মীকে সতর্ক করতে হবে ২. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান ৩. স্থানীয় থানায় ওই সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। ৪. থানায় ডায়েরি করার পর সংশ্লিষ্ট রসিদ হাতে রাখবেন ৫. থানা কোনো পদক্ষেপ না করলে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান।

বিচার ও শাস্তি

কাজের ক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার ২টো ভাগ আছে। কর্পোরেট ও নন-কর্পোরেট। কর্পোরেট ক্ষেত্র বলতে বোঝায় অফিস বা সংস্থার সহকর্মী বা বসের হাতে যৌন হেনস্তা আর নন-কর্পোরেট ক্ষেত্র বলতে বোঝায় বাড়ির পরিচারিকাকে যৌন হেনস্তা করা। কেস অনুসারে ২ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা হতে পারে।

সাত দশকের গল্প 'মুখরোচক'

টালিগঞ্জ মেট্রোর পাশে এখন যেখানে উত্তমকুমারের মূর্তি, ঠিক সেখানেই ছিল মুখরোচকের আঁতুরঘর। ১৯৭৮ সালে পাতালরেলের কাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ওখানেই ছিল একমাত্র দোকান। এরপরই মুখরোচকের নাম ছড়িয়ে পড়তে টালিগঞ্জ সিনেমা পাড়ায় তা খুব জনপ্রিয়তা পেল। শুটিংয়ের ফাঁকে বা আসা-যাওয়ার পথে অনেকেই দোকানে আসতেন। অনেকের সঙ্গে রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল মুখরোচকের কর্ণধার নির্মলেন্দু চন্দ্র'র। বাপি লাহিড়ীর বাবা অপরেশ লাহিড়ী নিয়মিত আসতেন। ভালোবাসতেন পাপড়ি দেওয়া চানাচুর খেতে। একদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসে হাজির। তাঁকে তাড়াতাড়ি চানাচুর প্যাক করে দিতে হবে, মুম্বাই যাবেন। চানাচুর নিয়ে যাবেন লতা মঙ্গেশকরের জন্য। এছাড়া নচিকেতা ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের যাতায়াত ছিল। উৎপল দত্তের শুটিং থাকলে ফ্লোর থেকে প্রোডাকশন ইউনিটের লোক চলে আসত মুখরোচকের দোকানে। সত্যজিৎ রায়ের জন্য চানাচুর কিনে নিয়ে যেতেন তপেন চট্টোপাধ্যায়। এত নামি লোকের দোকানে যাতায়াত থাকলেও মুখরোচকের মালিকের একটা ইচ্ছে ছিল। মহানায়ক একদিন তাঁর দোকানে চানাচুর নিতে আসবেন। সেই ইচ্ছেপূরণও হল। একদিন সন্ধ্যার দিকে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার। গাড়ি থেকে নেমে এলেন ড্রাইভার। পেছনের সিটে তখন বসে গাড়ির মালিক। কালো কাচের জন্য ভেতরটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার চানাচুরের একটা প্যাকেট কিনে গাড়িতে উঠে গেলেন। এরপর থেকে গাড়িটা প্রায়ই আসত। কয়েকদিন পর জানা গেল গাড়ির ভেতরে বসে থাকা মালিকের নাম। মহানায়ক উত্তমকুমার নিজেই সেখানে আসতেন। গাড়ি থেকে অবশ্য নামতেন না। মুখরোচকের কর্ণধার যেন ধন্য হলেন মহানায়কের আসার কথা জেনে।

এভাবে মুখরোচকের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দোকানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও আয়তন সবটাই বাড়ল। নির্মলেন্দু চন্দ্র পাশে আরো ২টো দোকান নিয়ে চানাচুরের পাশাপাশি অন্য

সামগ্রীর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুললেন। ব্যবসায় তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অন্য ভাইরাও। দোকানের পেছনে কারখানার জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই কারখানা তুলে নিয়ে যাওয়া হল টালিগঞ্জের গ্রাহাম রোডে। সেখানে তৈরি হল নতুন কারখানা। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিল কারখানা। সাতের দশকের গোড়ায় শহর কলকাতা অশান্ত হয়ে উঠল। শহরে নকশাল আন্দোলন শুরু হল। রাতে শুধু পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যেত। দিনেরবেলায় টালিনালা দিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকদের লাশ ভেসে যেত। মুখরোচকের কর্ণধার বুঝতে পারলেন, এই অবস্থায় টালিগঞ্জের বুকে কারখানা চালানো খুবই কঠিন কাজ। তাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন, কারখানা সরানো হবে অন্য জায়গায়। তখনই খবর এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবিন্দপুরে জমি, পুকুর সবটাই একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এরপরই কারখানা উঠে এল গোবিন্দপুরের লাঙলবেড়িয়ায়।

এরপর বাবার স্বপ্নকে সার্থক করতে এগিয়ে এলেন সুযোগ্য ছেলে প্রণব চন্দ্র। তাঁর হাত ধরে মুখরোচক চানাচুরের কারখানা এখন একটা আস্ত শিল্প। আরো ভালোভাবে বলতে হলে বাঙালির নিজস্ব রুচির খাবার। চানাচুর থেকে এই শিল্প আরো ডালপালা মেলে সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখরোচকের খাবারের তালিকায় এখন বাহারি চানাচুর ছাড়াও রয়েছে টিস্যাকস, এথনিক স্ন্যাকস, টিফিন স্ন্যাকস, ককটেল স্ন্যাকস, মিষ্টি ও শোনপাপড়ি। রাজ্যের সব দোকানে পাওয়া যায় মুখরোচকের পণ্য। অনলাইনের মাধ্যমেও চলছে বিশ্বজুড়ে বিপণন। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, বিগ বাস্কেটের মতো যে কোনো অনলাইন শপিং সাইটে মুখরোচকের খাবার কেনা যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবিন্দপুর এখন মুখরোচকের কারখানার জন্য নাম করেছে। সেখানে গেলে অবাক হতে হবে ওটা কারখানা নাকি বাগানবাড়ি। সবুজ লন, গাছ ভরতি উপচে পড়া বাহারি ফুল, কৃত্রিম ঝরনা, সুইমিং পুল আর তার মাঝে ৬ একর জমিতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি হচ্ছে চানাচুর সহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। সংস্থার ল্যাবরেটরিতে খুব সতর্কভাবে খাবারের গুণমান যাচাই করা হয়। মুখরোচকের খাবারের প্রতিটা প্যাকেটে লেখা থাকে নিউট্রিশন ভ্যালু। মুখরোচক আপাতত আইএসও ৯০০০:২০১৫, ২২০০০:২০০০৫ ফুড কোয়ালিটি সার্টিফায়েড। রফতানির কারণে আমেরিকান এফবিএ'র সব নিয়ম মেনে চলা হয়।

কে বলে বাঙালি ব্যবসার কিছু বোঝে না? শুধু চানাচুর দিয়েও যে বিশ্বকে জয় করা যায়, দুনিয়ার বাঙালিকে একজোট করা যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন নির্মলেন্দু চন্দ্র ও তাঁর ছেলে প্রণব চন্দ্র। মুখরোচকের কর্ণধারের আরেক প্যাশন বিনোদন। বাংলার সিংহভাগ সিরিয়াল ও রিয়েলিটি শোর অন্যতম স্পনসর মুখরোচক। বাংলার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে এক নিবিড় যোগ তৈরি হয়েছে। তাই বাংলা বিনোদন জগতের মানুষরা তাঁর এত কাছের হয়ে উঠেছেন।

মহিলা উদ্যমনিধি যোজনায় বাজিমাত

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও ছোটোখাটো ব্যবসায়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সিডবি'র অধীনে রয়েছে মহিলা উদ্যমনিধি যোজনা। এই যোজনার মাধ্যমে উৎপাদনমূলক ও পরিষেবামূলক ব্যবসায়ে মহিলাদের ঋণ দেওয়া হয়।

কারা ঋণ পাবেন

(১) নতুন ও চালু ব্যবসার জন্য (২) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে মেয়েদের কমপক্ষে ৫১ শতাংশ অংশীদারি থাকতে হবে। (৩) ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগ হতে হবে ৫ লাখ টাকা।

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

(১) প্রকল্প মূল্যের সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। (২) ঋণের পরিমাণ প্রকল্প মূল্যের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রতিটা প্রকল্প পিছু মহিলা উদ্যমীরা সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। (৩) ঋণ শোধ করতে হয় ১০ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে মোরেটোরিয়াম পিরিয়ড ৫ বছর। (৪) সুদের হার ব্যাঙ্ক ঠিক করে। (৫) প্রসেসিং ফি বছরে ১ শতাংশ। (৬) এই প্রকল্পে ঋণ নেওয়ার জন্য কোনো সমান্তরাল জামিন লাগে না।

কোন ব্যবসায় ঋণ মিলবে

অটো রিপেয়ারিং ও সার্ভিস, বিউটি পার্লার, কেবল টিভি নেটওয়ার্ক, ক্যান্টিন ও রেস্টুরেন্ট, ডিটিপি সেন্টার, ক্রেশ, সাইবার কাফে, ডে কেয়ার সেন্টার, টেলিফোন বুথ, মোবাইল রিপেয়ারিং সেন্টার, জেরক্স সেন্টার, অটো রিক্সা বা দু চাকার গাড়ি কেনা, টিভি রিপেয়ারিং, টেলারিং ইউনিট, ওয়াশিং মেশিন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ইত্যাদি।

ঋণ নিতে গেলে

ঋণ নিতে চাইলে যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। নির্ধারিত বয়ানে আবেদন করতে হবে। থাকতে হবে ওই ব্যাঙ্কে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে ব্যবসার প্রোজেক্ট রিপোর্ট, কেওয়াইসি ও সচিত্র পরিচয়পত্র।

মেয়েদের জন্য আরো প্রকল্প

মহিলা উদ্যমনিধি যোজনা ছাড়াও মেয়েরা ব্যবসা করার জন্য এই সব প্রকল্প থেকে ঋণ নিতে পারেন। যেমন-মুদ্রা যোজনা, সেন্ট কল্যাণী যোজনা, উদ্যোগীনি প্রকল্প, দেনা শক্তি যোজনা, অন্নপূর্ণা প্রকল্প, শ্রীশক্তি প্যাকেজ। সব প্রকল্পে সহজ সরল সুদে ঋণ পাওয়া যায়।

নাচের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরি : কোহিনূর সেন বরাট

সৃজনশীল নাচে নতুন ধারা এনেছেন নৃত্যগুরু **কোহিনূর সেন বরাট**। আগামী দিনের নাচ ও রিয়েলিটি শো নিয়ে অকপটে জানালেন মনের কথা।

■ **লকডাউনের এই অস্থির সময়ে কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন?**

কোহিনূর : চরম অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছি। কেউ বলতে পারছে না কবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। আমরা প্রত্যেকেই আগামী দিনের জন্য বাঁচি, জানি না সেদিন কেমন আসবে। কিন্তু এটাও ঠিক, জীবন থেমে থাকে না। অনলাইনে যেমন নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছি তেমন নানা অনুষ্ঠানে অংশও নিচ্ছি।

■ **অনলাইনে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?**

কোহিনূর : নতুন প্রজন্ম আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় অনলাইনে ভালো সাড়া পাচ্ছি।

■ **কী মনে হয়, আগামী দিনে এই ডিজিটাল মাধ্যমই কি মঞ্চের বিকল্প হবে?**

কোহিনূর : অনলাইনে লেখাপড়ার মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা ধীরে ধীরে ডিজিটাল মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। কিন্তু এই মাধ্যম কখনো মঞ্চের বিকল্প হতে পারে না। নৃত্যগুরুরা অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে ভালো আয় করতে পারেন কিন্তু নৃত্যশিল্পীরা মূলত, মঞ্চের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রোজগার করেন। তাঁরা এই সময়ে খুব সমস্যায় রয়েছেন। কারণ, গানবাজনা লোকে শোনে কিন্তু নাচ ও নাটক মঞ্চ ছাড়া হয় না।

■ **নাচের শিল্পীদের কোনো ফোরাম নেই?**

কোহিনূর : নাচের শিল্পীদের জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল ডান্স ফেডারেশন নামে একটা সংগঠন রয়েছে। চন্দ্রোদয় ঘোষ সভাপতি। কিন্তু আর্টিস্ট ফোরামের মতো শক্তিশালী সংগঠন নয়।

■ **আপনি কার কাছে নাচের তালিম নিয়েছেন?**

কোহিনূর : আমি ১০ বছর বয়সে নাচের জগতে এসেছি। আমার নাচের গুরু শম্ভু ভট্টাচার্য। মূলত, ওনার হাতেই তৈরি হয়েছি। ভারতনাট্যম শিখেছি অনিতা মল্লিক ও পিনাকী রায়ের কাছে।

■ **কত বছর বয়সে প্রথম নাচের অনুষ্ঠান করেন?**

কোহিনূর : মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রথম অনুষ্ঠান করি কলকাতার প্রেসিডেন্সি হলে। প্রথম পেশাদার অনুষ্ঠান করি রানিগঞ্জের একটা মঞ্চে।

■ **ক্যালকাটা কয়্যারের দায়িত্ব কবে নিলেন?**

কোহিনূর : আমার দাদা সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট ১৯৭৯ সালে ক্যালকাটা কয়্যার প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার

ডান্স ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলাই।

■ **এরপরের জার্নিটা কীরকম?**

কোহিনূর : ২০১১ সালে কোহিনূর ডান্স আকাদেমি তৈরি করি। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় আর কয়্যারের দায়িত্ব সামলানো সম্ভব হয় না।

■ **আপনার নাচ কোন ধারার?**

কোহিনূর : ভারতীয় ধ্রুপদী ও সৃজনশীল নাচ। এই দুই ধরনের ঘরানার এক মিশ্র নাচ। সব সময়ে চেষ্টা করি নাচের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও গৌরবকে সকলের সামনে তুলে ধরতে। আমার ধারা আমার নিজস্ব।

■ **আপনার কাছে নাচ কি শুধুই বিনোদন?**

কোহিনূর : আগেই বলেছি আমি শম্ভুদার ছাত্র। উনি নাচের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা তৈরি করেন। নাচের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরেন। আমিও সেই ট্র্যাডিশন বয়ে নিয়ে চলেছি। নাচ আমার কাছে নিছক বিনোদন নয়।

■ **আপনার সেরা প্রোডাকশন কোনটা?**

কোহিনূর : কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব। ক্যালকাটা কয়্যারের জন্য গুপি-বাঘার কাণ্ড, ক্ষীরের পুতুল, আলিবাবা'র কাজ করে খুশি হয়েছি। তবে আমার অন্যতম সেরা কাজ রাবণ ও মহাভারত। রামায়ণে রাবণ চরিত্রকে আমরা সবাই খলনায়ক হিসাবে দেখি। এখানে রাবণকে একজন ধার্মিক, দাতা, সবার ওপরে নায়ক হিসাবে দেখানো হয়েছে। ওই প্রোডাকশনে ২৮ জন ছেলে কাজ করেন। এতে রয়েছে ভারতনাট্যম, ক্রিয়েটিভ ও ছৌ নাচের মিশেল। দারুণ হিট। আমার মহাভারত প্রোডাকশনেও ২৮টা মেয়ে কাজ করেন। সেখানেও মহাভারতকে নতুনভাবে ইন্টারপ্রিটেশন করা হয়।

■ **টিভির রিয়েলিটি শো নিয়ে কী বলবেন?**

কোহিনূর : নতুন প্রতিভা বিকাশের এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা রিয়েলিটি শো। গত কয়েক বছর ধরে এই ধরনের রিয়েলিটি শো থেকে গান ও নাচের জগতে অনেক নতুন প্রতিভা উঠে এসেছে। কিন্তু চটজলদি জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও টাকা পেয়ে বিজয়ীরা নিজেদের ধরে রাখতে পারেন না। অল্পদিনে হারিয়ে যান। নাচ একটা সাধনা। নিরন্তর চর্চা চালিয়ে যেতে হয়। এটা তাঁরা বুঝতে পারেন না।

সঙ্গীতের মহাযুদ্ধ'য়ের মঞ্চে মীর

এই প্রথমবার সঙ্গীতের মঞ্চে সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে মীরকে। একেবারে অন্য সাজে অন্য ইমেজে ধরা দেবেন। গানের এই নতুন রিয়েলিটি শো'র নাম সঙ্গীতের মহাযুদ্ধ। প্রযোজনায় রাজ চক্রবর্তী। আগস্ট মাস থেকে কালার্স বাংলায় সম্প্রচার হবে। ১৬ জন প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগীর মধ্যে চলবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রতিযোগীর তালিকায় রয়েছেন তীর্থ, দীপমালা হালদার ও সৌম্য চক্রবর্তীর মতো পরিচিত মুখ। সঞ্চালক মীরকে আমরা মীরাক্কেল ও অন্যান্য মজাদার অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় দেখেছি। এবার নতুন ভূমিকায় তাঁকে কেমন দেখাবে তার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা।

বাংলাকে ফিরে দেখা ১৪ পাতার পর

- ভারতের প্রথম থিয়েটার হল- কলকাতায় (১৯০৭)।
- ভারতের সবচেয়ে উচ্চতম বহুতল বাড়ি- কলকাতায় (৪২ তলা)।
- ভারতের প্রথম ভাসমান বাজার- কলকাতার পাটুলিতে।
- ভারতের সবচেয়ে বড়ো ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পানীয় জলের ট্যাঙ্ক- কলকাতার টালা ট্যাঙ্ক।
- দেশের প্রথম ফুটবল লিগ- কলকাতা ফুটবল লিগ।
- প্রথম হকি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়- কলকাতা হকি ক্লাব।
- ভারতের প্রথম হাই কোর্ট- কলকাতা হাই কোর্ট (১৮৬২ সালের ১ জুলাই)।
- ভারতের বৃহত্তম ফুটবল মাঠ- যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন।
- ভারতের বৃহত্তম ক্রিকেট খেলার মাঠ- ইডেন গার্ডেন।
- ব্রিটেনে প্রথম ভারতীয় ডাক্তার- ডঃ অপূর্ব চ্যাটার্জি।
- ভারতের প্রথম গাড়ি কেনা হয়- ১৮৯৭ সালে।
- ভারতের প্রথম পর্বতারোহী- তেনজিং নোরগে।
- ভারতের প্রথম সাতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন- মিহির সেন (১৯৫৮) ও আরতি সাহা (মহিলা) ১৯৫৯ সালে।

সংকলন ঃ **মধুমিতা দাশ**

হেঁসেল

সুস্বাদু অথচ এই সময়ে শরীর ভালো রাখে এমন কিছু খাওয়ার নিয়ে লিখেছেন নাটকের অভিনেত্রী ও সুগৃহিনী

পায়েল সামন্ত

ঝিঙে দিয়ে ছোলার ডাল

উপকরণ- সেদ্ধ ছোলার ডাল দেড় কাপ, খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কাটা ঝিঙে ২৫০ গ্রাম, মিহি করে কুঁচোনো বড়ো মাপের পেঁয়াজ ১টা, মিহি করে কুঁচোনো আদা ২ চা চামচ, মিহি করে কুঁচোনো রসুন ৪ কোয়া, কুঁচোনো টমেটো ১টা, আমচুর ১ চা চামচ, গরম মশলা হাফ চামচ, কুঁচোনো কাঁচা লঙ্কা ৪টি, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনেপাতা ১ চামচ, নুন ও হলুদ দরকার মতো, পাতিলেবুর রস ২ চা চামচ।

কীভাবে তৈরি করবেন-

তেল গরম করে তাতে কুঁচোনো পেঁয়াজ, আদা, কাঁচালঙ্কা, রসুন গরম করে ভেজে নিন। এরপর টমেটো দিয়ে কষুন। ঝিঙের টুকরোতে নুন, হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো দিন। কষা মশলায় ছাড়ুন। ঝিঙের জল বেরিয়ে সেদ্ধ হলে ডাল দেবেন। আমচুর ও অল্প জল দিন। ঝিঙে সেদ্ধ হলে ও ফুটে উঠলে নামিয়ে গরম মশলার গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস ও কুঁচোনো ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পটল পোস্ত

উপকরণ- চেঁচে নেওয়া পটল ১০/১২ টা, পোস্ত বাটা ১০০ গ্রাম, নুন, সরষের তেল দরকার মতো, কাঁচালঙ্কা চেরা ৪-৫টা, পেঁয়াজ ২টো।

কীভাবে তৈরি করবেন-

প্রথমে সব পটল অল্প ভেজে তুলে রাখুন। তেলে পেঁয়াজ ভেজে তাতে পোস্ত বাটা, নুন, চিনি দিয়ে কষে কাঁচালঙ্কা ও অল্প জল দিন। ভাজা সব পটল ছাড়ুন। ফুটে উঠলে পটল সেদ্ধ হলে মাখো মাখো করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

পাবদা বড়ি ঝোল

উপকরণ- পাবদা মাছ ৬টা, নুন, হলুদ দরকার মতো, সরষের তেল দরকার মতো, কালোজিরে ১/২চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৩/৪টে চেরা, কলাই ডালের বড়ি ১০/১২ টা।

কীভাবে তৈরি করবেন-

প্রথমে সরষের তেল গরম করে বড়িগুলো ভেজে তুলে নিন। মাছগুলো কেটে, বেছে পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে অল্প ভেজে তুলে রাখুন। বাকি তেলে কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে জল দিন। তাতে নুন, হলুদ, ভাজা বড়ি ও ভাজা মাছ দিন। ফুটে উঠলে কাঁচা সরষের তেল ১ চামচ ওপর থেকে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

কালো, তা সে যতই কালো হোক

কৃষ্ণা আচার্য, বিউটি থেরাপিস্ট

মেয়েদের গায়ের রঙ চাপা কিংবা শ্যামবর্ণা হলেই শুরু ফিসফাস। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও গায়ের রঙ দিয়ে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়। অথচ এটা কি জানেন মহাভারতের সবচেয়ে সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র দ্রৌপদীর গায়ের রঙ ছিল কালো। সেজন্যই কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় বান্ধবীর নাম দিয়েছিলেন কৃষ্ণা। বিজ্ঞান বলছে, মেলালিন পিগমেন্টের পার্থক্যের কারণেই কেউ ফর্সা বা কেউ কালো হয়।

শ্যামলা মেয়েরা সঠিক রূপচর্চার মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারেন অনন্যা। টেক্কা দিতে পারে যে কোনো দুধে আলতা রঙকে। প্রথমে জানাই কিছু ঘরোয়া উপায়ের কথা।

২ চামচ কালো জিরে বাটা ৪ চামচ ঘিয়ের সঙ্গে মেশান। রোজ স্নানের আগে এই মিশ্রণটা মুখে ও গায়ে মাখুন। এছাড়া ২ চামচ বাদাম বাটা সমান পরিমাণ কাঁচা দুধের সঙ্গে মেশান। এটাও রোজ স্নানের আগে গায়ে মাখতে পারেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ত্বক চকচকে হয়ে উঠবে।

কালো মেয়েদের ত্বক সাধারণত তৈলাক্ত হয়। বলিরেখাও কম দেখা যায়। কিন্তু ব্রণ বা র‍্যাশের সমস্যা হতে পারে। সপ্তাহে একদিন গরম জলের সঙ্গে কয়েকটা তুলসী পাতা ফেলে দিয়ে ওই ভাপটা মুখে লাগান। এরপর চন্দনবাটা, মুলতানি মাটির গুঁড়ো, অল্প মধু, কয়েক ফোঁটা পাকা পাতিলেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে মাখুন। রোদে যাঁদের বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়, তাঁরা কয়েকটা দুর্বা ঘাস, সামান্য কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সারা মুখে মাখুন। কিছুক্ষণ পরে কুসুম জলে ও পরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন। বরফের কুচি পাতলা কাপড়ে বেঁধে সারা মুখে ঘষুন।

কেমন মেকআপে নজর কাড়বেন

হালকা রঙের ফাউন্ডেশন ব্যবহার করবেন না। এতে আরো কালো দেখাবে। আপনার জন্য ফাউন্ডেশনের রঙ হবে আইভরি বা গাঢ় বাদামি রঙের। গোলাপী, লালচে, বাদামি রঙ ব্যবহার করতে পারেন। ফাউন্ডেশন লাগানোর পরে মুখের নানা অংশকে হাইলাইট করার জন্য ব্লাশার ব্যবহার করুন। মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাতে চাইলে গাঢ় লাল বা গাঢ় গোলাপী রঙের ব্লাশার ব্যবহার করতে পারেন। গায়ের রঙ জলপাইয়ের মতো বা গাঢ় বাদামি যাই হোক না কেন এই ২টো রঙ আপনাকে মানাবেই। তৈলাক্ত ত্বক হলে ড্রাই ব্লাশার ব্যবহার করুন। শুষ্ক ত্বক হলে ক্রিম ব্লাশার ব্যবহার করতে হবে।

কথা বলবে আকর্ষণীয় ঠোঁট

অনেকের ধারণা, কালো মেয়েদের হালকা রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করলে ভালো লাগবে। এটা ভুল ধারণা। এর বদলে আপনি লাল, মেরুন, চকলেট, বাদামি রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। খুব কালো মেয়েরা লালচে রঙ ব্যবহার করুন। চকচকে কিছু ব্যবহার করবেন না।

লাল, বাদামি, চকলেট বা গাঢ় রঙের কফি নেলপালিশ লাগান। অরেঞ্জ বা পিচ রঙের কোনো শেড ব্যবহার করবেন না।

চোখের ইশারা

কৃষ্ণ বর্ণের মেয়েদের আসল সম্পদ হল তাদের চোখ। 'কালো তা সে যতই কালো হোক/ দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ...'। তাই চোখের সৌন্দর্য ধরে রাখতে রোজ ভিটামিন এ যুক্ত খাবার খান। চোখের চারপাশে কালি পড়লে রোজ কাঁচা দুধ তুলোয় করে লাগাতে পারেন। এছাড়াও গাজর ও শশার রস একসঙ্গে মিশিয়ে চোখের চারপাশে লাগান। চোখ ২টো আকর্ষণীয় করতে আইশ্যাডো, আইলাইনার, কাজল, মাস্কারা ব্যবহার করুন। চোখে কাজল ব্যবহার করলে আসবে এক মাদকতা। হয়ে উঠবেন রহস্যময়ী। চাপা বর্ণের মেয়েরা ঘন নীল আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। যাঁদের চোখ বসা, তাঁরা চোখের নীচের পাতায় কোনো হালকা কাজল পরুন।

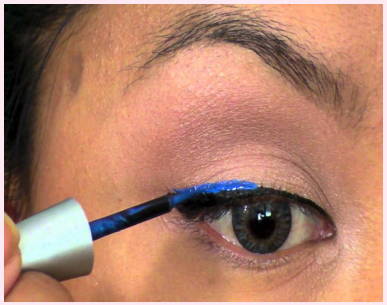

হাসিতে করুন মন জয়

হাসিতেই লুকিয়ে থাকে অপার সৌন্দর্য। তাই নিয়মিত দাঁতের পরিচর্যা দরকার। সপ্তাহে অন্তত একদিন মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করুন। এর একটা সহজ উপায় রয়েছে। আধ কাপ ভিনিগার, আধ কাপ ওয়াইন, আধ কাপ মধু ও এক চামচ লবঙ্গের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে গরম করুন। পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা ব্যবহার করুন। সপ্তাহে একদিন সরষের তেল আর নুন দিয়ে ব্রাশ করলে দাঁত চকচকে থাকবে।

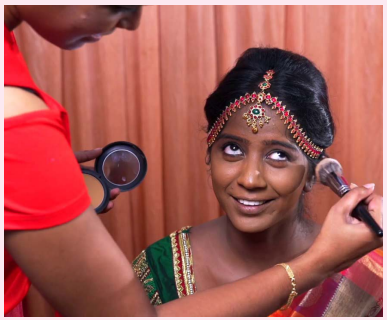

বিধান রায়ের অজানা গল্প

তনুশ্রী চক্রবর্তী

বিহারের পাটনায় বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম। বাবা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন ডাকবিভাগের সামান্য মাইনের কর্মচারী। ১৮৯৭ সালে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯০১ সালে গনিতে অনার্স নিয়ে পাটনা কলেজ থেকে বি . এ. পাশ করার পর কলকাতায় আসেন। এখানে এসে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেন। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার চিঠি আগে আসায় তিনি মেডিকেলে ভর্তি হন। এই সময় খুব অর্থ কষ্ট ভোগ করতে হয়। বই কিনে পড়ার ক্ষমতা ছিল না বলে সহপাঠীদের সাহায্য নেন। কখনো মেল নার্সের কাজ , কখনো ট্যাক্সি চালিয়েও তিনি অর্থ রোজগার করেন। ৫ বছরে একটা বই কিনেছিলেন ৫ টাকা দিয়ে ।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কর্ণেল লিউকিস বিধানচন্দ্রকে ছেলের মতো দেখতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এল.এম.এস পরীক্ষায় বসেন ও পাশ করে সরকারী হাউস ফিজিশিয়ান হিসাবে চাকরি পান। পাশাপাশি তৈরী হতে থাকেন এম.ডি পরীক্ষার জন্য। কর্ণেল লিউকেস তাকে পরামর্শ দেন বিলেতে গিয়ে এম . আর.সি. পি ও এফ.আর.সি.এস পড়তে।

মাইনে থেকে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করে মাত্র ১২০০ টাকা নিয়ে ১৯০৮ সালে এম ডি পাশ করে বিলেতে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন ভর্তির দিন চলে গেছে। মন খারাপ নিয়ে কলেজ চত্বরে ঘোরাঘুরি করছেন এমন সময় একজন রোগীকে দেখিয়ে হাসপাতালের সুপার বলে উঠলেন -- তুমি কি বলতে পারবে রোগীটির কি হয়েছে? বিধানচন্দ্র রায় রোগীকে স্পর্শ না করেই বলে দিয়েছিলেন -- রোগীটির চিকেন পক্স হয়েছে। সুপার আবার জিজ্ঞেস করলেন - তুমি বুঝলে কি করে? রোগীর শরীরে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিধানচন্দ্র উত্তর দিলেন -- রোগীর শরীরের গন্ধ থেকে তিনি এটা বলছেন। এরপর দেখা গেল রোগীটির চিকেন পক্সই হয়েছে। খুশী হয়ে সুপার তারিখ চলে গেলেও ভর্তি করে নেন।

এখান থেকেই ১৯০৯ সালে মেডিসিন ও সার্জারি দুই ক্ষেত্রেই সম্মানের সাথে তিনি দুটো ডিগ্রি লাভ করে ১৯১১ সালে দেশে ফিরে দেশের মানুষের জন্য চিকিৎসা শুরু করলেন। ১৯১২-১৯১৯ কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে অ্যানাটমি বিভাগে শিক্ষকতার পাশাপাশি শুরু করেন ডাক্তারি প্র্যাকটিস।

তিনি ছিলেন ধন্বন্তরী। কালক্রমে তাঁর জনসেবা পৌঁছে গিয়েছিল বার্মা থেকে বালুচিস্তান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল , জওহরলাল নেহরু, জন কেনেডি -- বিখ্যাত লোকের চিকিৎসা তিনি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন তিনি।

প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিনামূল্যে তিনি চিকিৎসা করতেন। যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরীতে তাঁর অবদান ছিল।

পূর্ববঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদার বাড়িতে বিধানচন্দ্র রায়ের ডাক পড়েছে। বাড়ির গৃহবধূ খুব ই অসুস্থ। কোন ডাক্তার তার রোগ ধরতে পারছে না। বিধানচন্দ্র সেখানে গেলেন ও রোগীর সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর রোগীর সাথে কথা বললেন ও জানালেন তিনি রুগীকে তো সারিয়ে তুলবেন তবে তার কথামতো চলা হলে তবেই। কোনো মেডিসিন তিনি দেন নি। তিনি বললেন এ রোগীর চিকিৎসা একমাত্র সম্ভব যদি তাকে গড়গড়ায় তামাক খেতে দেওয়া হয়। তা আস্তে আস্তে ছাড়াতে হবে। তাই করা হল। রোগিনী সুস্থ ও হয়ে গেল। আসল ঘটনা হল তিনি দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে যখন কেউ তামাক সেবন করে ও হঠাৎ করে ছেড়ে দেয়। সেই লক্ষণগুলি ভীষন ভাবে স্পষ্ট ছিল। দেখা গেছে সেই রোগী বিয়ের আগে লুকিয়ে গড়গড়ায় তামাক খেতেন।

বিধানচন্দ্র রায়- ১৯১৬ সালে বিধানচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯১৮ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। বিধানচন্দ্র রায়ের রাজনীতির গুরু হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। ১৯২৫ সালে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯২৮ সালে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৩১ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বোম্বাই থেকে ফেরার পথে ওয়ার্ধা স্টেশনে তিনি গ্রেপ্তার হন ও কারবরণ করেন। ১৯৩১-১৯৩৩ এই সময় তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে আইনসভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি তিনি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। যা বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

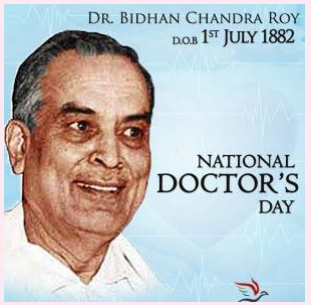

তিনি ছিলেন এই রাজ্যের নবরূপকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে — ফরাক্কা ব্যারেজ হলদিয়া নদী বন্দর, দার্জিলিং এ পর্বতারোহন শিক্ষাকেন্দ্র, পাঁচটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা -- কল্যানী - দুর্গাপুর - বিধাননগর - অশোকগড় কল্যানগড়- হাবড়া। পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধপ্রকল্প , ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। দিল্লিতে থাকা খাওয়ার সুবিধার জন্য বঙ্গভবন করেন।

সত্যজিত রায়ের পরিচালনায় পথের পাঁচালী ছবিটি সরকারী প্রযোজনার ব্যবস্থা তিনিই করেন। যা পরবর্তীকালে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, বাঙালী ছেলেরা পাঞ্জাবি ছেলেদের মতো বাস চালাতে পারছেনা। বাস ভাঙচুর করছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে উত্তর দেন- -'ওদের বাস ওরা ভাঙবে তাতে তোমার এত গাত্রদাহ কেন? ভাঙতে ভাঙতে ওরাই একদিন দক্ষ হয়ে উঠবে।' এমনই ছিল তাঁর বিধান। তিনি বুঝেছিলেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন শিল্পের। সেই সাথে শিক্ষার। ছেলেরা যাতে বাস চালাতে পারে ও পরিবহনের কাজ পায় সেইজন্য তিনি বাস পরিবহন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় করণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন বেশ কিছু কাজ নিয়ে। দেখা করবেন জন কেনেডির সঙ্গে। ভারতের রাষ্ট্রদূতকে সে কথা জানাতেই তিনি বলেন, প্রোটোকলে আটকাবে।

বিধানচন্দ্র বেঁকে বসলেন। বললেন -- রাখো তোমার প্রটোকল। ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে। জানালেন তাঁর ইচ্ছা। মিলল ছাড়পত্র। মুখোমুখি বসে আলাপ আলোচনা। বাংলা - ভারতবর্ষ - মার্কিন। শেষ পর্যায়ে যখন আলোচনা তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বললেন -- আপনার কাছে একটা বিষয় বলার আছে। কেনেডি বললেন -- বলুন। -- আমি শুনেছি, দীর্ঘদিন ধরে একটা পিঠের যন্ত্রণা আপনাকে ভোগাচ্ছে। চমকে উঠে কেনেডি বললেন -- আপনি এ সব জানলেন কি করে ? -- আমি পেশায় ডাক্তার। নেশায় রাজনীতিবিদ। কেনেডি অভিভূত হলেন ও চিকিৎসায় রাজি হলেন। বিধানচন্দ্র বললেন -- কথা হল, চিকিৎসা হল। এবার আমার ফিসটা? কেনেডি-- বলুন ! -- কলকাতার জন্য ৩০০ কোটি টাকা সাহায্য চাই। রাজী হলেন কেনেডি।

ভারতবর্ষে ফিরে অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এর সাথে কথা বলতেই তিনি নাকচ করে দিলেন। -- বিধানচন্দ্র নেহেরু র দ্বারস্থ হলেন।

নেহেরু মোরারজি দেশাইকে বললেন --- ওকে ঘাটিও না ।

তারপর যা হল তা হল ইতিহাস। টাকা এল। নতুন করে সাজানো হল কলকাতা ।

এই অসাধ্য সাধন তিনি করেছিলেন মৃত্যুর ঠিক আড়াই বছর আগে।

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে তিনি ভূষিত হন --- ভারতরত্ন । ১৯৯১ সাল থেকে ১ জুলাই দিনটি সারা ভারতবর্ষে 'ডক্টরস ডে' হিসেবে পালন করা হয়।

উত্তমকুমার ও স্বর্ণযুগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহানায়কের চলে যাওয়ার চার দশক পরেও বাঙালির স্মৃতিতে তিনি এখনো স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বাঙালির আইকন। উত্তমকুমার। এই প্রজন্মের নেটপ্রেমীদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। এই সময়ের উত্তম অনুরাগীরা মহানায়ককে নিয়ে তৈরি করেছেন নিজস্ব একটি গ্রুপ। 'উত্তমকুমার ও স্বর্ণযুগ'। এই গ্রুপটি তৈরি হয় ২০১৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। মূল উদ্যোক্তা কল্লোল অস্থির চক্রবর্তী। সঙ্গে রয়েছেন অরিজিৎ ভট্টাচার্য ও সৌরীশ দাস। দলের সদস্য সংখ্যা ৩৫,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়াও রয়েছে দলের নিজস্ব ওয়েবসাইট। সামাজিক মাধ্যম ছাড়াও এই গ্রুপ মাঠে নেমে নানা ধরনের কাজ করে। ৩ সেপ্টেম্বর উত্তমকুমারের জন্মদিন ও ২৪ জুলাই মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও সারা বছর ধরে উত্তমকুমারকে নিয়ে চর্চা হয়। উদ্যোক্তা কল্লোল অস্থির চক্রবর্তীর কথায়, 'সারা বছর ধরে আমরা নানা ধরনের কাজ করি। যেমন, সপ্তপদী রেস্তরাঁয় দলের সদস্যদের নিয়ে আমরা সভা করেছি। এফএম চ্যানেলে মহানায়ককে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। সদস্যদের নিয়ে চণ্ডীমাতা ফিল্মসের কর্ণধার সত্যনারায়ণ খাঁর গ্রামের বাড়ি হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের গোয়ালপোতায় বেড়াতে গেছি। ওই জায়গায় উত্তমকুমারের ধন্যি মেয়ে সহ অনেক সিনেমার শুটিং হয়েছে। এই গ্রুপের উদ্যোগে উত্তমকুমার ও স্বর্ণযুগ নামে একটা বার্ষিক পত্রিকা বের করা হয়। সহ সম্পাদক সৈকত ভট্টাচার্য। ২০১৯ সালে এই পত্রিকা প্রথম বেরোয়। উদ্বোধন করেন প্রবীণ অভিনেতা শঙ্কর ঘোষ। আমরা অন্যরূপে মহানায়ক নামে স্বল্প দৈর্ঘ্যের এক তথ্যচিত্র তৈরি করি। এছাড়াও মহানায়ককে নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী করেছি। আমাদের মূল লক্ষ্য হল, মহানায়ককে নিয়ে ধারাবাহিক চর্চার মধ্যে থাকা ও নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করা।'

২ বাংলার এই সময়ের জনপ্রিয় মুখ

জয়া এহসান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চল্লিশেও জয়া টেক্কা দিচ্ছেন টলি সুন্দরীদের। তাঁর অভিনয়ের ছটায় মজে রয়েছে দুই বাংলা। দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, মিষ্টিভাষী ও এক অদ্ভুত সরলতায় মাখা মুখখানি এই মুহূর্তে ভীষণ জনপ্রিয়। তিনি জয়া এহসান। গত মাসে ৪০'য়ের কোঠায় পা দিয়েছে। তাতে কী! শুধু রূপের জাদুতেই নয়, ফিটনেসে যে কোনো উঠতি অভিনেত্রীর মনে ঈর্ষা জাগাতে পারেন। টেক্কা দিতে পারেন নিখুঁত অভিনয় দিয়ে। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার পরিচালকরা তাঁকে এই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

জয়া এহসানের জন্ম বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলায়। বাবা এ এস মাসউদ মুক্তিযোদ্ধা ও মা রেহানা মাসউদ ছিলেন একজন শিক্ষিকা। জয়ারা ২ বোন ও ১ ভাই। অভিনয় শুরুর আগে জয়া নাচ ও গানের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকাও শিখেছেন।

জয়া ২০০৪ সালে মোস্তাফা সরওয়ার ফারুকীর 'ব্যাচেলর' ছবি দিয়ে সিনেমার জগতে পা রাখেন। পরে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ পরিচালিত 'গেরিলা' ছবিতে বিলকিস বানু চরিত্রে অভিনয় করে ২০১২ সালে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র

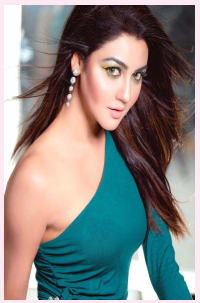

উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। এরপর পরিচালক অরিন্দম শীলের হাত ধরে এপার বাংলার সিনেমা জগতে পা রাখেন। ২০১৩ সালে অভিনয় করেন আবর্ত ছবিতে। এরপর জয়া এক এক করে সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ সহ টলিপাড়ার একাধিক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর অভিনীত 'বিসর্জন', 'বিজয়া', 'কণ্ঠ', 'রবিবার' সবার মনে দাগ কাটে। ২০১৯ সালে রবিবার ছবির পর অতনু ঘোষের 'বিনি সুতোয়' ঋষিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জয়া এহসান জুটি বাঁধেন। অভিনয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশে জয়ার নিজের একটা প্রযোজনা সংস্থাও রয়েছে, সি-তে সিনেমা। ২০১৮ সালে জয়ার প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথম ছবি 'দেবী' মুক্তি পায়।

ব্যক্তিগত জীবনে জয়া বাংলাদেশের মডেল ও অভিনেতা ফয়সাল এহসানের সহধর্মিনী ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১৪ মে তাঁরা বিয়ে করেন। তবে ২০১১ সালে ফয়সালের সঙ্গে জয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। কাজের ফাঁকে নিজের দেশ বাংলাদেশে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। কাজের সূত্রে কলকাতায় এসে জয়া জানান, আগামী দিনে দুই বাংলার সিনেমা জগতে সমানতালে কাজ করতে চান। ভালোবাসেন কলকাতার রসগোল্লা খেতে ও বাংলা সিনেমা দেখতে। তাঁকে নিয়ে অনেক গসিপ শোনা গেলেও এই মুহূর্তে কাজই তাঁর জীবনসঙ্গী।